এখন সুন্দরবনের মানুষ পালাতে চাইছে

তুষার কাঞ্জিলাল

একটানা চল্লিশ বছর ধরে সুন্দরবনে বাস করে সুন্দরবনের সমস্যাগুলোকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। শিক্ষক হিসাবে, সমাজকর্মী হিসাবে সুন্দরবন উন্নয়নে তাঁর অবদানের কথা সকলেরই জানা। সুন্দরবন উন্নয়নের নানা দিক নিয়ে 'শুধু সুন্দরবন' পত্রিকার সম্পাদকের সাথে কথা বললেন পদ্মশ্রী তুষার কাঞ্জিলাল।

শুধু সুন্দরবন ঃ আপনার সাম্প্রতিক লেখালিখিতে সুন্দরবন উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাকে কিছুটা হতাশ মনে হচ্ছে কেন?

তুষার কাঞ্জিলাল ঃ হতাশ নয়। আমি আসলে একটা বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে চাইছি। আমি যেহেতু দীর্ঘদিন সুন্দরবনে বাস করেছি তাই আমার লেখায় কোনো ম্যানুপুলেশনের জায়গা নেই। বাস্তব যা ঘটনা তাই লিখছি এবং সেটা হতাশা ব্যাঞ্জক বলে যদি তোমার মনে হয়ে থাকে তাহলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি মনে করি না যে হতাশ হওয়ার মত কোনো কারণ আছে। একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবনের অজস্র মানুষের অমানবিক দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে। এরকম ঘটনা বহু জায়গায় বহুভাবে ঘটেছে, কিন্তু এখানে একটু বিশেষ ধরনের এই কারনে যে এটা বোধ হয় শেষ নয়, আইলা কিন্তু সুন্দরবনে শেষের শুরু। এটা চলতে থাকবে। এই জায়গায় আমাদের অনেক কিছু করার আছে। আমরা বলতে সুন্দরবনের মানুষ, তাদের জনপ্রতিনিধিরা, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এমনকি আন্তর্জাতিক যে সংস্থাগুলি কাজ করছে-এই অবস্থা সৃষ্টির পিছনে কিন্তু সবার কিছু কিছু অবদান আছে। আমি মনে করি এই অবস্থাটাকে কাটিয়ে উঠতে গেলে একটা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের দরকার। সেই আন্দোলনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকবে সুন্দরবনের মানুষদের। হতাশ হওয়া আমার চরিত্রে নেই, হতাশ আমি হই না।

শুধু সুন্দরবন ঃ সুন্দরবনে এখন যাঁরা বাস করেন তাঁরা কোনো না কোনো জায়গা থেকে এসে বসবাস করছেন। আপনি কি মনে করেন তাঁরা সুন্দরবনকে নিজেদের জায়গা বলে মনে করেন? যদি না করেন তাহলে সেটা কি সুন্দরবন উন্নয়নের একটি অন্যতম অন্তরায় নয়?

তুষার কাঞ্জিলাল ঃ এটা দুটো দিক থেকে বুঝতে হবে- যেমন ধর আজ থেকে কত বছর আগে বাংলাদেশ ভাগাভাগি হয়েছে কিন্তু আজও বাংলাদেশের বয়স্ক মানুষেরা বলেন আমাদের ওপারে অমুক জায়গায় বাড়ি ছিল। আসলে আদি পুরুষদের কথা মানুষ সহজে ভোলে না। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম এটা মনে রাখবে বলে আমার মনে হয়না।

সুন্দরবনের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, ধর এর চার প্রজন্ম আগে জায়গাটা হচ্ছে কতগুলি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, বন হিসাবে প্রকৃতি গড়ে তুলেছে, এবং একটা বিশেষ ধরনের গাছপালার বন, যেটাকে বাদাবন বলা হয়। বিশেষ ধরনের জন্তু-জানোয়ার, পাখি এসব দিয়ে একটা অপূর্ব সুন্দর পরিবেশের প্রাকৃতিক অবস্থান তৈরি হয়েছিল। তা আমাদের দেশের অংশে ১০২টি দ্বীপ ছিল। এখন দুটো সমুদ্র নিয়ে নিয়েছে ১০০টাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে আবার ৫৪টাতে আবাদ গড়ে উঠেছে-অর্থাৎ মানুষ বসবাস করে। আর ৪৮টাতে ফরেস্ট-কভার আছে। যেটাকে সুন্দরবন বলি আজকাল আমরা, যার মাথায় নানারকম পালক দেওয়া হয়। এখন এই ৫৪টা দ্বীপে কেন জঙ্গল কাটা হল? ব্রিটিশ সরকার একটা সময় বুঝল এই এতবড় একটা অঞ্চল এখান থেকে আমাদের কোন আয় আসছে না। অতএব আয় পাওয়ার জন্য অনাবাসী কিছু জমিদার, লটদার যেমন ধর স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন, ইলাপাল চৌধুরী এরকম সব বড় বড় জোতদার/জমিদারদের জমি লিজ দেওয়া হল। লিজ নিয়ে

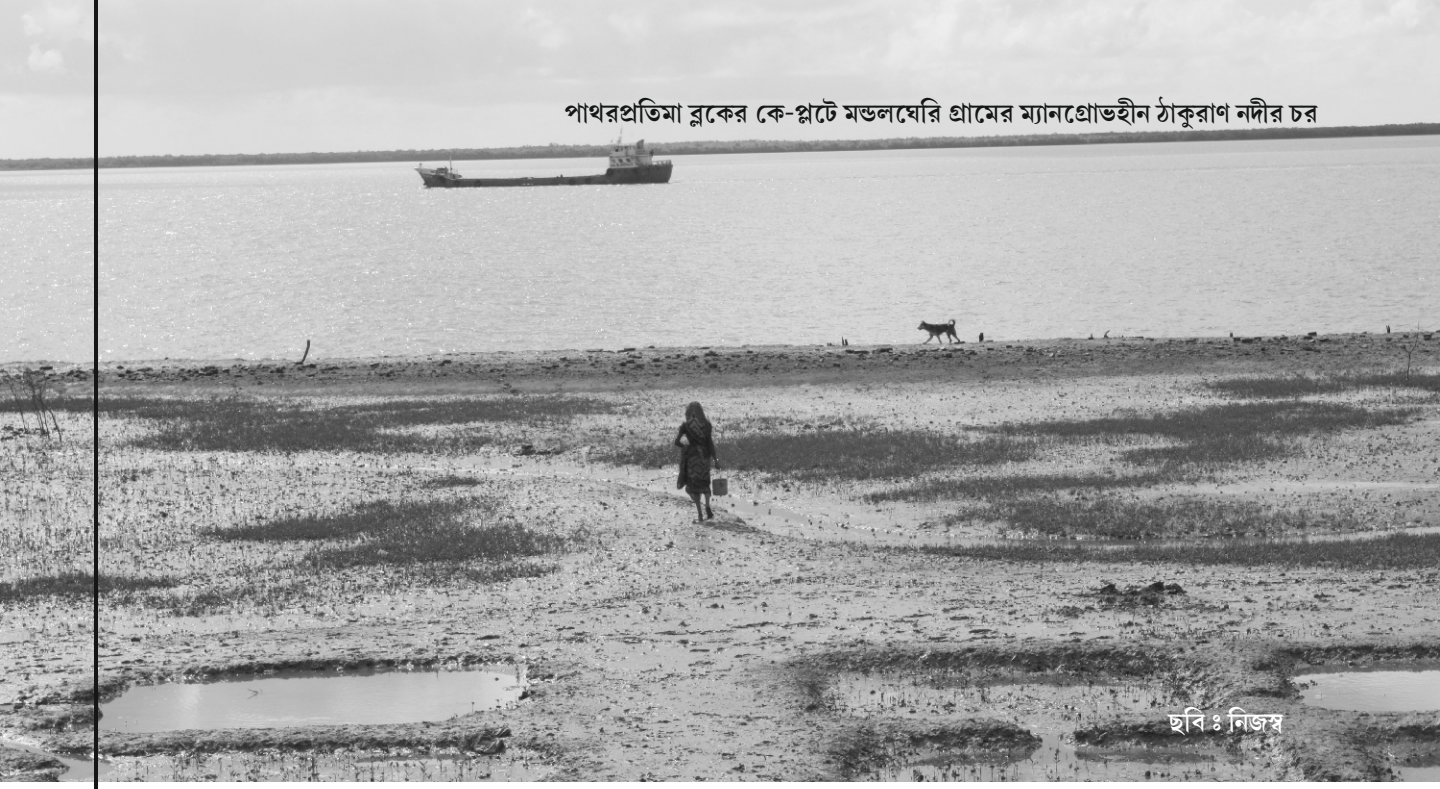

পাথরপ্রতিমা ব্লকের কে-প্লটে মন্ডলঘেরি গ্রামের ম্যানগ্রোভহীন ঠাকুরাণ নদীর চর

ছবি ঃ নিজস্ব

জমিদাররা কিজন্য গিয়েছিল? জমিদাররা তো জঙ্গলের সৌন্দর্য্য দেখে দিন কাটাবার জন্য ওখানে যায়নি। ওরা গিয়েছিল মধ্যসত্ত্ব ভোগ করে কিছু আয় করার জন্য। তা মধ্যসত্ত্ব ভোগ করতে গেলে মানুষ বসাতে হবে। ওখানে যারা বসতি গড়ে তুলেছিল তারা মূলত তিনটি জায়গা থেকে এসেছিল- এক সাঁওতাল পরগনার ওঁরাও আর ভূমিজ, আর একটা বিরাট অংশ ছিল যশোর এবং খুলনা থেকে। আর একটা অংশ এসেছে মেদিনীপুর থেকে। মেদিনীপুরের লোকেরা বরাবরই চ্যালেঞ্জিং। তুমি যদি গোটা সাগরদ্বীপে যাও ওখানে প্রায় দেড় দুই লক্ষ লোক বাস করে এরা প্রায় সকলেই মেদিনীপুরের। তাদের সংস্কৃতি, তাদের কথাবার্তা, ঘরবাড়ি, আচার-আচরণ, সংস্কার সবকিছু কিন্তু মেদিনীপুরের। এদের প্রপিতামহ হয়তো এখানে এসেছিলেন। এমন ফ্যামিলিও আছে যাদের কিছু অংশ হয়তো এখানে আছে বাকিরা এখনও মেদিনীপুরেই আছে। যশোর খুলনা থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রে দেশ ভাগ হয়ে যাওয়াতে সমস্যা কিছুটা বদলে যায়। যাইহোক যারা প্রথম এখানে বাস করতে এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির। তখন যতখুশি জমি নেওয়া যেত। হয়তো কোনো গ্রাম থেকে প্রথমে এসেছিলেন একজন সে যখন মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেল তখন সে তার গ্রামের লোকেদের বা আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিদের আনতে লাগল। যার জন্য তুমি যদি সুন্দরবনে ঘোর, তাহলে দেখবে ওই এক একটা পাড়া একই পরিবারের। কাজেই সুন্দরবন আমার বাড়ি নয় একথা তারা খুব উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলে না।

কিন্তু যে কথাটা বলা দরকার এখন সুন্দরবনের মানুষ পালাতে চাইছে। কেননা তারা আস্তে আস্তে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে যে এই জায়গাটায় স্থায়ীভাবে তারা বসবাস করতে পারবে। বা ৩৫/৪০ বছরের মধ্যে জায়গাটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে না। এই বিশ্বাসটা ক্রমশই কমছে, ফলত সুন্দরবনে তুমি এমন সম্পন্ন মানুষ খুব কম পাবে যারা নাকি সুন্দরবনের বাইরে মেনল্যান্ডে যেমন ধর ক্যানিং থেকে গড়িয়া, যেমন হাসনাবাদ থেকে বারাসাত, কাকদ্বীপ থেকে আমতলা, রায়দিঘি থেকে উত্তরে এক একটি ছোট ছোট সুন্দরবন গড়ে তুলেছে। অবস্থাসম্পন্নরা দুটো কারনে চলে আসতে চাইছে এক তাদের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ ওখানে নেই এটা তারা বুঝেছে এবং এটাও বুঝেছেন আমাদের অস্তিত্ব এখানে বারে বারে বিপন্ন হতে পারে। মেধা এবং অর্থ যাঁদের আছে তাঁরা সুন্দরবন ছাড়তে চাইছেন। সুন্দরবনের বেশিরভাগ জমি একফসলী, কোন বড় শিল্প নেই কোনদিন হবে না; ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের অবস্থাও খারাপ কাজেই একটি মাত্র ফসল নির্ভর অর্থনীতিতে যেসব নিম্ন আয়ের মানুষ আছে তাঁরাও পালাতে চাইছেন। আগেও ছিল আইলার পর আরও বেড়েছে। তুমি কোথায় না পাবে সুন্দরবনের মানুষকে, তুমি আন্দামানে যাও, পুনেতে যাও, বম্বে যাও, দিল্লির চপ্পল কারখানায় যাও পাবে। এখানেও তাই প্রথমে একজন গেছে পরে আরও কয়েকজন কে নিয়ে গেছে। এভাবে সুন্দরবনকে

জমিদাররা তো জঙ্গলের সৌন্দর্য্য দেখে দিন কাটাবার জন্য ওখানে যায়নি। ওরা গিয়েছিল মধ্যসত্ত্ব ভোগ করে কিছু আয় করার জন্য।

তারা আস্তে আস্তে ছাড়ছে। অর্থাৎ এটা আমার কাছে একটা দীর্ঘস্থায়ী ট্রানজিট। মানে একবার উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে আবার উদ্বাস্তু হতে হবে।

শুধু সুন্দরবন ঃ সুন্দবন আর সুন্দরবনের মানুষকে কি একসাথে বাঁচানো সম্ভব?

তুষার কাঞ্জিলাল ঃ বাঁচানো সম্ভব। যদি আমরা পৃথিবীর সবাই মিলে কিছু কাজ করি এবং কিছু কাজ করা থেকে বিরত থাকি। প্রথমতঃ সুন্দরবন থাকতে গেলে একটা জিনিস দরকার সবচেয়ে বেশি সেটা হল প্রকৃতির সাথে একটা সমঝোতা। তোমাকে প্রকৃতির ইচ্ছাকে বুঝতে হবে। এবং প্রকৃতির সাথে লড়াইটা করা যাবে না। আমরা কি করেছি? প্রকৃতি তো এটাকে জঙ্গল হিসাবে গড়ে তুলেছিল, আমরা ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টা দ্বীপের জঙ্গল পুরোপুরি হাসিল করে দিয়েছি। মানে পুরো ধ্বংস করে দিয়েছি। মাত্র ৪৮টাতে জঙ্গল রেখেছি, তাও তাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছি না। কেননা জনসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। ধর ভারতবর্ষের যে সুন্দরবন তার জনসংখ্যা প্রায় ৪৭ লক্ষ এবং এই জনসংখ্যা বাড়ার ফলে জঙ্গলের ওপর আগ্রাসন অনেক বেড়েছে। ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধের নীচের চরে আমাদের গাছে ভরে দিতে হবে। দ্বীপের মধ্যে প্রচুর গাছ লাগাতে হবে। আর একটা গাছও কাটতে পারবো না। চরের প্রকৃত মালিক কে এটা এখনও ঠিক হয়নি ফলে দেখা যাচ্ছে গাছগুলো যখন একটু বড় হচ্ছে তখনই এগুলো আমরা কেটে ধ্বংস করে দিচ্ছি। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, মানুষ সবাই কিন্তু এই কুকর্মে লিপ্ত হয়ে আছেন। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে সুন্দরবনে টিকে থাকা মুস্কিল।

দ্বিতীয়ত ঃ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু ও পরিবেশের যে পরিবর্তন তাতে করে সমুদ্রতল উঠে আসছে ফলে এই যে ফ্রাজাইল এমব্যাঙ্কমেন্ট, ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। আর সুন্দরবন ঘূর্ণীঝড় প্রবণ অঞ্চল। বছরে কয়েকবার এখানে ঘূর্ণীঝড় আছড়ে পড়বেই। কাজেই পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ দূষণের যে কুফল অন্যান্য অঞ্চলের মত সুন্দরবনও ভোগ করছে তাকে আটকাতে গেলে গোটা বিশ্বের মানুষকেই সচেতন হতে হবে। তুমি তো জান সেই কিয়োটো চুক্তি থেকে ডেনমার্কে যেটা হল- অনেক বক্তৃতা হল, কিন্তু কেউ আমরা আন্তর্জাতিক হতে পারলাম না। আমরা জাতীয় স্বার্থটাকে বজায় রেখে পৃথিবীর পরিবেশের কথা ভাবতে বসি ফলে অবস্থাটা যা ছিল প্রায় তাই থেকে গেছে।

শুধু সুন্দরবন ঃ সুন্দরবনের পরিবেশের এই সঙ্কটকালে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনকে কি আপনি মহাপুরুষ বলে মনে করেন?

তুষার কাঞ্জিলাল ঃ স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনকে ঠিক মহাপুরুষ এভাবে আখ্যায়িত করাটা একটু মুস্কিল। ড্যানিয়েল ছিলেন স্কটল্যান্ডের লোক। মনে রাখবে স্কটদের একটু ব্যবসায়ী মনবৃত্তি থাকে এবং ওরা একটু কৃপণ প্রকৃতির হয়। কিন্তু ভারতে ইংরেজ আমলে যেসব সাদা চামড়ার মানুষ কিছু ভালো কাজ করেছেন তাঁরা প্রায় সবাই স্কচ। হ্যামিলটন একটা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। ওঁর এক সন্তান হয়েছিল সে মারা যায়। তখনকার মুক্তচিন্তায় তিনি আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এঁদের সাথেও মত বিনিময় করতেন। উনি যে সুন্দরবনে গিয়েছিলেন এবং যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তা চিন্তার দিক থেকে অসাধারণ। এর অন্য ব্যাখ্যাও আছে তিনি নাকি ইংরেজদের বুঝিয়েছিলেন এভাবে তোমরা বেশিদিন রাজত্ব করতে পারবে না। রাজত্ব করতে হলে তোমাদের রায়তদের সাথে মিলতে হবে এবং সেই মেলার পন্থা হল সমবায়।

আমি যেটা ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি হি ওয়াজ আ নোবেল সোল, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সমবায় ভিত্তিক সমাজ। ভাব তখনকার দিনে তিনি যে স্কুলটা করেছিলেন গোসাবায় সেটার নাম দিয়েছিলেন গোসাবা রুরাল রিকনস্ট্রাকশন স্কুল। বোঝাই যায় রাস্কিন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের মাটিতে খুব একটা মাইক্রো লেভেলে একটা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

গোসাবা অঞ্চলে তুমি যদি ঘুরে বেড়াও তাহলে কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ড্যানিয়েলের খুব বেশি ইমপ্যাক্ট পাবে না। কারণটা হচ্ছে তিনি তো জমিদারি চালাতেন। তিনি তার এক পয়সা আয় নিতেন না কিন্তু তাঁর অধীনে যারা কাজ করত তারা তো ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা তারা তো হ্যামিলটন ছিল না।

উনি বছরে একবার যেতেন। ল্যাঙ্গুয়েজ একটা বার ছিল। সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে পারতেন না। কাজেই প্রায় বলতে পারি এ গড হু ফেইলড।

শুধু সুন্দরবন ঃ সুন্দরবনে যেসব এন.জি.ও কাজ করছে তাদের অনেকেরই বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ শোনা যায়। এ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কিরকম ?

তুষার কাঞ্জিলাল ঃ প্রথমত ঃ এন.জি.ও শব্দটাতেই আমার আপত্তি আছে। আমি নিজে ঐ শব্দটা ব্যবহার করি না। দ্বিতীয়ত ঃ ভারতে ইংরেজ আমল থেকে সরকারি প্রচেষ্টার সাথে সাথে বেসরকারি প্রচেষ্টা চলে আসছে। তখনকার দিনে তুমি ভেবে দেখ শিলং এর এক পাহাড়ের উপরে একজন বৃদ্ধ যাজক বা যাজিকা বসে আছেন। তাঁদের অবশ্য ধর্মান্তরিত করণের কিছুটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাঁরা সেবাও করতেন। তারপরে গান্ধী, গান্ধীজী তো বলেছিলেন স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেস তুলে দাও। সেবার কাজে একে নিয়োজিত কর।

আসলে সামগ্রিক ভাবে মানব সভ্যতা রসাতলে যাচ্ছে, মানুষ আজকে সহযোগিতার কথা ভাবে না সবসময় প্রতিযোগিতার কথা ভাবে। মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে যে কোন বস্তু থাকা দরকার সেটাই মনে রাখে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অবক্ষয় চলছে তার সুযোগ নিচ্ছে বহু শয়তান। কেন এই অবক্ষয় সেকথা বলতে গেলে বহুকথা বলতে হয়-গ্লোবালাইজেশন, সব কিছুকে কমোডিটি বানানোর চেষ্টা, মানুষ হিসাবে অনেক বেশি নিকৃষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবণতা আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। তার ছাপ এক্ষেত্রেও পড়ছে।

তুমি তো এইটুকু বললে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছি। বিহার, উত্তরপ্রদেশে তো দেখেছি এন.জি.ও বিয়েতে পণ হিসাবে দেওয়া হয়। বিদেশী টাকাও অনেক ক্ষেত্রে লোভ বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমার কথা যদি বল আমি কেন এই সংগঠনে, এই সংগঠনের একটা অন্য ইতিহাস আছে, যাঁরা এটা তৈরি করেছিলেন যেমন জয়প্রকাশ নারায়ণ, পান্নালাল দাশগুপ্তের মতো লোকেরা, যাঁরা কিন্তু সারা জীবনটাই দান করেছেন। পরবর্তীকালে আমি এসছি বা অন্যরা এসেছেন। আমরা কিন্তু অন্য জায়গা থেকে এসেছি। আমাদের মধ্যে ইমোশানটাই বেশি ছিল। ধর আমি রাজনীতি থেকে একটা গ্রামে চলে গেছি। আমি যদি রোজগারের কথা ভাবতাম তাহলে অনেক বেশি রোজগার করতে পারতাম। তা এই যে একটা ইমোশন বা একটা কমিটমেন্ট এটা কমে যাচ্ছে। সার্বিক অবক্ষয়ের সাথে মিলিয়ে দেখলে এই আগাছাদের বুঝতে পারবে, কিন্তু এরা আগাছাই।

তুষার কাঞ্জিলালের ছবি ঃ সৌমেন দত্ত